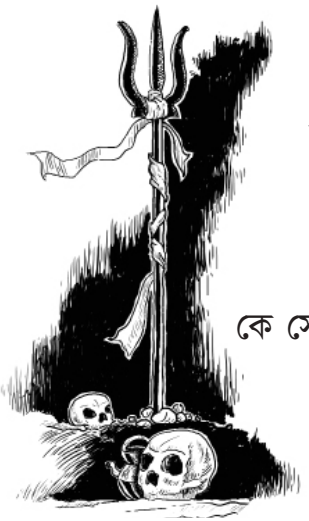

# সূচিপত্র


চণ্ডাল ১১

কে সেই বিশ্বাসঘাতক ৩৯

প্রতিশোধ ৮৭

কালভদ্র ১৪৮

# চণ্ডাল

জন্মানোর সাথে সাথে মায়ের মৃত্যু হয়েছিল বলে ছেলেটাকে তার ঠাকুমা অপয়া বলত। গ্রামের প্রতিটা মানুষের মুখে মুখে চলে চলে ওর নামটাই হয়ে গিয়েছিল অপয়া। ছেলেটার বাবা তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। মনে তার একটা কথাই চলত বারে বারে যে এই ছেলেটাকে পৃথিবীতে আনতে গিয়েই তার অমন লক্ষ্মীমন্ত বউটা পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। বউটাকে যে বড়ো ভালোবাসত নিমাই। তাই বউটা চলে যাওয়ার পর গ্রামের শেষ প্রান্তের চোলাইয়ের ঠেকটাকেই সে করে নিয়েছিল তার ঠিকানা। একটু বড়ো হতেই ছেলেটা সবার চোখে দেখেছিল নিজের প্রতি ঘৃণা। ঘৃণা, তাচ্ছিল্য আর কটূক্তি সহ্য করতে করতে তার মনটা ভরে গিয়েছিল সবার প্রতি ঘৃণায়। যেদিন ছেলেটার ঠাকুমা চোখ বুজেছিল সেদিন গ্রামের কোনো মানুষ তার চোখে এক ফোঁটাও জল দেখেনি। কী করে দেখবে? দশ বছরের ছেলেটার মনটা যে ততদিনে পাথর হয়ে গিয়েছিল। মায়ের সৎকার করে এসে ছেলেটার বাবা তাকে আর বাড়িতে রাখতে চায়নি। সারারাত বাড়ির সামনের পাঁচিলে বসে থাকতে থাকতে ভোর রাতে সে চলে গিয়েছিল যেখানে তার ঠাকুমার সৎকার হয়েছিল সেই শ্মশানে। ঠাকুমাকে পোড়ানোর সময় সে দেখেছিল কিছু মানুষকে গায়ে ছাই মেখে ভর সন্ধেবেলায় নেশা করতে। তারা যেন কেমন চুম্বকের মতো টেনেছিল ওকে। বাবা তাকে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়ার পর সেই রাতে সে পাঁচিলে বসে বসে বার বার ওই শ্মশানে দেখা মানুষ গুলোর প্রতি টান অনুভব করেছিল। ভোর রাতে যখন সে পৌঁছায় ওখানে তখন জ্বলন্ত চিতার সামনে বসে তাদের হাসি তামাশা করতে করতে কিছু খেতে দেখেছিল। মায়া, মমতা,

ভালোবাসা এই শব্দগুলো তো অনেক দিন আগেই ওর অভিধান থেকে মুছে গিয়েছিল। কিন্তু এই দিন ভয়, ভীতি গোছের শব্দগুলোও ওর কাছ থেকে চির বিদায় নিল। ওই মানুষ গুলোর পাশে বসে সেদিন সে অবাক চোখে দেখেছিল মৃত মানুষের আধ পোড়া মাংস নির্বিকারে তারা খেয়ে চলেছিল। সুরা পাত্র হিসেবে ব্যবহার করতে দেখেছিল মানুষের মাথার খুলিকে। সেইদিন থেকে ওই ছোট্ট ছেলেটার আপন হয়ে উঠেছিল শ্মশান আর ওই শ্মশানবাসী মানুষগুলো। ওই মানুষগুলোর কাছেই শিখতে শুরু করেছিল সে অঘোর বিদ্যা। মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে চিতা সাজিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল সে। মাস তিনেক পর যেদিন ছেলেটা দেখেছিল তার বাবার মৃতদেহ নিয়ে তার গ্রামের লোককে শ্মশানে ঢুকতে, সেদিন সে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। গ্রামের লোকের শত বলাতেও মুখাগ্নি করে তার বাবার আত্মার শান্তি কামনা করেনি সে। সেইদিন তার নাম বদলে গিয়েছিল। গ্রামের লোক তাকে হৃদয়হীন চণ্ডাল বলে ডেকেছিল। পছন্দ হয়েছিল তার। চেঁচিয়ে বলেছিল সে গ্রামের লোকেদের, "হ্যাঁ, আমি চণ্ডাল।"

সেইদিন থেকে তার নতুন নাম হয়েছিল 'চণ্ডাল।' অঘোরীবাবাদের সাথে থাকতে থাকতে শিখে নিচ্ছিল সে অঘোরবিদ্যার প্রতিটা খুঁটিনাটি। প্রতিটা সিদ্ধিপ্রাপ্তির সাথে সাথে আরও শক্তিপ্রাপ্তির নেশা তাকে পাগল করে তুলছিল। কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে তাকে দাঁড়াতে হল। যে শক্তির অধিকারী সে হতে চায় সেটা হতে গেলে কঠোর তন্ত্রসাধনার দরকার। তাতে সে প্রস্তুত। বহু বছরের সাধনার পর সে যেটা পাবে সেটা কল্পনাতীত। শুরু করে দিল সে কঠোর তন্ত্রসাধনা। সময় তার নিজের নিয়মে এগিয়ে চলল। তত দিনে চণ্ডালবাবা হিসেবে বেশ খানিকটা পরিচিতি সে পেয়ে গিয়েছিল। নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও পৌঁছাতে শুরু করে দিয়েছিল কতজন। কিন্তু এক-আধজন ভাগ্যবানেরই সমস্যার সমাধান করত চণ্ডাল। বাকিদের দিকে ফিরেও তাকাত না সে। এমনই একজন ভাগ্যবান ছিল মধুময় কর্মকার। সস্ত্রীক মধুময় কর্মকার পৌঁছেছিল চণ্ডালের কাছে পুত্র সন্তানের কামনায়। সেই সময় মাস খানেক ধরে যতজন সাহায্যপ্রার্থী পৌঁছেছিল চণ্ডালের কাছে, প্রতিটা মানুষই ফিরে এসেছিল হতাশ হয়ে। মধুময়ের স্ত্রী আরতিকে দেখে না জানি কেন ফেরাতে পারেনি সে। ছোটোবেলায় চণ্ডাল তার ঠাকুমার যখন মন ভালো থাকত তখন তার কাছে নিজের লক্ষ্মীমন্ত মায়ের কথা বেশ কয়েকবার শুনেছিল। বোধহয় মধুময়ের স্ত্রী আরতির সঙ্গে নিজের মায়ের মিল পেয়েছিল কোথাও। পরের দিন রাত বারোটা নাগাদ স্নান সেরে রক্তবর্ণ শাড়ি পরে আরতি মধুময়ের সঙ্গে পৌঁছায় শ্মশানে। দু জায়গায় জ্বলন্ত চিতা পার করে পৌঁছায় দুজনে চণ্ডালের কাছে।

মধ্যরাত পেরোতে শুরু হয় বিধি। প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে চলতে থাকে এসব। সব শেষে একটা কালো কার বার করে নিয়ে আসে চণ্ডাল। কারের সঙ্গে বাধা ছিল একটা খুব ছোটো লাল পুঁটলি। আরতির হাতে দিয়ে বলে, "কাল সূর্যাস্তের পর কোমরে বেঁধে নিবি এটা। যেদিন জানতে পারবি তুই মা হতে চলেছিস সেদিন কার থেকে এই লাল পুঁটলিটা খুলে ফেলে দিবি জলে। মনে রাখবি মধ্যরাতের পর ফেলবি। কারটাকে কোমরে বেঁধে রাখবি যতক্ষণ না ব্যথা উঠছে বাচ্চা হওয়ার। হাসপাতালে যাওয়ার আগে এই কালো কারটা অবশ্যই খুলে ফেলবি কোমর থেকে। যতক্ষণ না খুলবি এই কারটা ততক্ষণ বাচ্চা হবে না। যদি ভুলে গেছিস তাহলে বাচ্চা পেটের ভেতরই দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে। সাথে তুইও বাঁচবি না। কালো কারটাকে তোর বরের হাতে দিবি।"

কথাগুলো বলে চণ্ডাল পাশে রাখা মড়ার খুলি থেকে খানিকটা সুরা পান করল। তারপর মধুময়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "কালো কারটাকে কোনো গাছের তলায় পুঁতে দিবি বুঝলি। কোনো ভুল না হয় মনে রাখবি। আর হ্যাঁ শোন তোকে আমি একটা কাগজে মুড়ে একটু ছাই দেব। খুব সাবধানে রাখবি ওটাকে। কোনো মেয়ে যেন ওটার সংস্পর্শে না আসে। তোর বউ বাচ্চা হতে হাসপাতালে যাওয়ার আগে এই ছাই দিয়ে একটা ছোটো টিপ পরিয়ে দিবি ওর কপালে। তারপর যেখানে কালো কারটা পুঁতেছিলি সেখানে এই ছাইটাকেও পুঁতে দিবি। এই যা যা বিধি বললাম এতে যেন কোনো ভুল না হয়। তাহলেই বিপদ। বিশেষ করে ছাইটাকে সাবধানে রাখবি। তোর বউ ছাড়া আর যেন কোনো মেয়ে এটা ছুঁতে না পারে।"

প্রতিটা কথার সাথে সাথে মাথা নেড়ে যাচ্ছিল মধুময়। চণ্ডাল সব বিধি-বিধান বুঝিয়ে পাশে রাখা ছিলিম ধরাল। একটা বড়ো দেখে টান দিয়ে জোরে চেঁচাল, "জয় মা!"

কেঁপে উঠল মধুময় আর আরতি। চণ্ডাল মধুময়ের হাতে একটা ছোটো লাল কাগজের পুরিয়া দিয়ে বলল, "এতে ছাই আছে, সাবধান।"

আরতির হাত-পা ঠান্ডা হওয়ার জোগাড়। কোনো মতে উঠে দাঁড়িয়ে মধুময়ের হাত ধরে বেরিয়ে এল শ্মশান থেকে। ওরা শ্মশানের থেকে একটু দূরে রেখেছিল গাড়িটা। গাড়িতে উঠে মধুময়ের পাশে বসেই মধুময়ের হাতটা চেপে ধরে আরতি বলল, "এখানে এসে ভুল করলাম না তো? শুনেছি বিধি করতে গিয়ে কিছু ভুল হলে নাকি সাংঘাতিক বিপদ হয়। তখন নাকি এরাও আর বাঁচাতে পারে না।"

আরতির কথা শোনার পর মধুময়ের মনে হল যেন ও নিজের হার্টবিট শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু আর পেছোনোর রাস্তা নেই। যে পথে ওরা এগিয়ে

গিয়েছিল সেখান থেকে ফেরার কোনো রাস্তা নেই। গাড়ি স্টার্ট করল মধুময়।

পরের দিন সূর্যাস্তের পর স্নান করে আরতি বেঁধে নিল কোমরে কারটা। আড়াই মাস পর টেস্টের রিপোর্ট বলে দিল যে আরতি মা হতে চলেছে। সেদিন মধ্যরাতের পর মধুময়ের সঙ্গে আরতি গিয়ে কোমরের কার থেকে খোলা ছোট্ট লাল পুঁটলিটাকে জলে ফেলে এল। এখনও অবধি প্রতিটা নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মানা হয়েছিল। এর পরের বিধি প্রসব বেদনা শুরু হওয়ার পর করার জন্যে বলেছিল চণ্ডাল। কিন্তু এর পর কয়েক মাস যে এক প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার সঙ্গে কাটবে সেটা মধুময় আর আরতি বেশ বুঝতে পারছিল। একটা সন্দেহ ওদের মনের মধ্যে অহরহ চলতে থাকত যে এত কিছু করেও যদি পুত্রসন্তান না হয়? কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি? কেন পুত্রসন্তানের জন্যে এ ভাবে মরিয়া হয়ে ওঠা? এর পেছনে আছে এক ইতিহাস। অনেক সময় কোনো কোনো মানুষের জেদবশত নেওয়া সিদ্ধান্ত অন্য অনেক মানুষের জীবনকে ছারখার করে দিতে পারে। বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা, মধুময়ের বাবা অনিরুদ্ধ কর্মকার-এর ব্যাবসা দিন দিন ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। কলকাতার পশ এলাকাতে ছিল তার বিশাল তিনতলা বিলাসবহুল বাড়ি। মধুময়রা তিন ভাই এক বোন। সব ভাইবোনই মানুষ হয়েছিল প্রাচুর্যের মধ্যে। চার ভাইবোনের মধ্যে সব থেকে ছোটো ছিল বোন মধুমতী। মধুময়ের বড়দা মনোহর আর মেজদা মনোজিৎ-এর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বাড়ির সবাই মধুমতীর বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। বড়োলোকের সুন্দরী মেয়ে মধুমতীর জন্যে বহু জায়গা থেকে সম্বন্ধ আসতে লেগেছিল। কিন্তু কলেজে পড়ার সময় মধুমতী পলাশ নামে একটি ছেলেকে ভালোবেসে ফেলেছিল। ছেলেটি কিন্তু মধুমতীকে ভালোবেসেছিল ওর বাবার টাকার লোভে। ধুরন্ধর ব্যবসায়ী অনিরুদ্ধর সেটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু মুশকিল যেটা হয়েছিল সেটা হল মধুমতীকে বোঝানো যায়নি। বাবার মুখের ওপর এক কাপড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল মধুমতী পলাশের সঙ্গে। কিন্তু মধুমতীর এই হেন কাজে পলাশ ভেতরে ভেতরে বেজায় চটেছিল মধুমতীর ওপর। যদিও মুখে কিছু প্রকাশ করেনি। মনের তলানিতে একটা আশা ধিক ধিক করে জ্বলেছিল পলাশের যে মধুমতী যদি অন্তঃসত্ত্বা হয় তাহলে ওর বাবা মা আর ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবে না। তখন পলাশ নিজের ছেঁদো চাকরিটাকে লাথি মেরে ওই বিলাসবহুল তিনতলা বাড়িটায় গিয়ে উঠতে পারবে। জীবনটা হয়ে যাবে তখন স্বপ্নের মতন। যেদিন স্বপ্নপূরনের দিন এল, অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে নিতে এল বাবা অনিরুদ্ধ আর মা মালতী, সেদিন কিন্তু তাদের